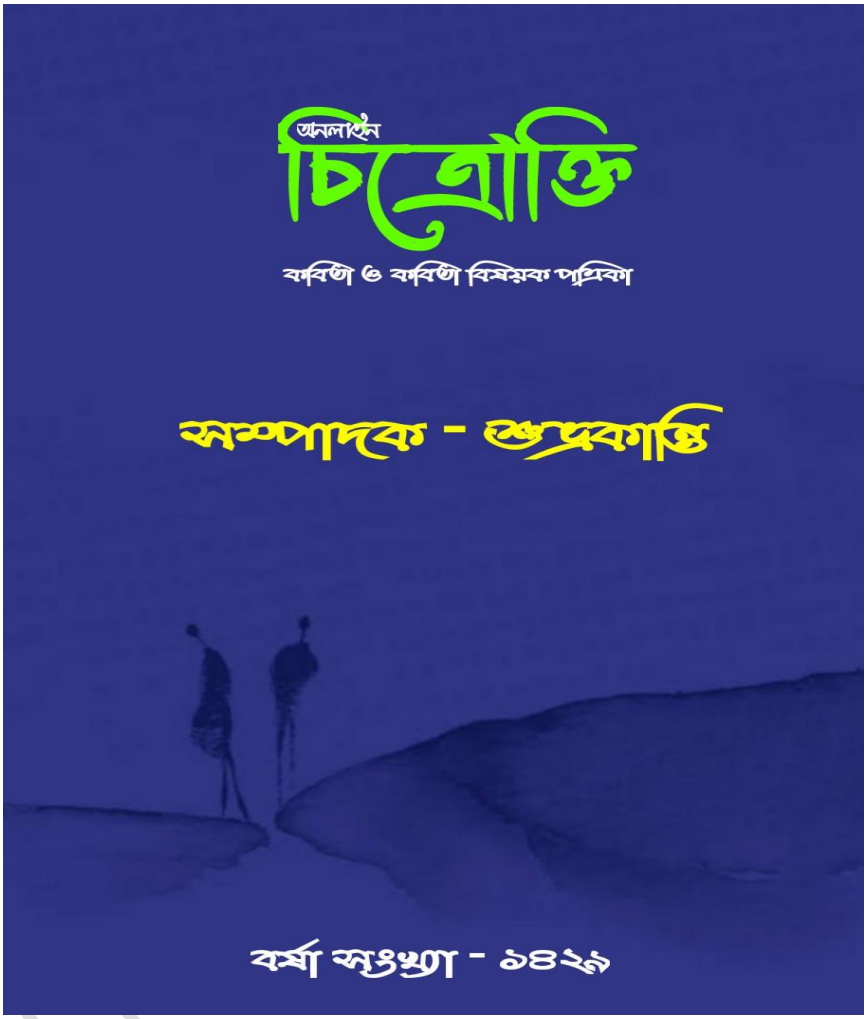

ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, পঞ্চম অনলাইন সংখ্যা,
জুন-জুলাই ২০২২, বর্ষা ১৪২৯

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল । ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে । যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি । এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমরা এই সংখ্যার আগেই পঁচিশে বৈশাখ এবং এগারো জৈষ্ঠ্যকে মনে রেখে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছি। আশাকরি এই পঞ্চম সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে আগের সংখ্যাগুলোর মতই ।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

"চিত্রোক্তি"
সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়

"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট" বোস পাড়া রোড, বড়িশা পূর্ব পোস্ট, কলকাতা – ৭০০০০৮	"আর ভি বৃন্দাবনম অ্যাপার্টমেন্ট" ব্লক - সি, বালাজি নগর, মিয়াপুর, হায়দ্রাবাদ - 500049, তেলেঙ্গানা

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org
www.chitrokti.org

লেখক সূচি

কবিতা

- আশিস সান্যাল – একদিন : 06
- রমেশ পুরকায়স্থ – যে যায় কী ফেরে আর : 06
- পার্থ রাহা – রূপকথা : 07
- পঙ্কজ সাহা – মেঘ শতক : 07
- দীপক কর – সাশ্রু অস্তরাগ : 08
- কাজল চক্রবর্তী – গোধূলিপাখি : 08
- তেজেশ অধিকারী – প্রেমের কবিতা : 08
- কালিদাস ভদ্র – বর্ষা : 08
- গৌরী সেনগুপ্ত – কলির আত্মকথা : 09
- ভবানীশংকর চক্রবর্তী – পদ্যকাহিনি : 09
- আবীর চট্টোপাধ্যায় – বৃষ্টি : 09
- লিপিকা চট্টোপাধ্যায় – রোমন্থন : 10
- শশাঙ্কশেখর অধিকারী – ভালোবাসার কবিতা : 10
- সাতকর্ণী ঘোষ – অপেক্ষা : 10
- জ্যোতি ঘোষ – কাচপোকার টিপ : 11
- নীলাঞ্জনা হাজরা – বৃষ্টিস্নাত মধ্যরাতে : 11
- সন্দীপ জানা – অব্যক্ত : 12
- ব্রততী চক্রবর্তী – কথার শিয়রে কথা : 12
- শংকর ঘোষ – খোদাই : 12
- বীথি কর – আকাশ_ছোঁয়া : 13
- শোভন বিশ্বাস – বৃষ্টির ফোঁটা : 13
- সন্দীপ কুমার মান্না – গ্রহণ লেগেছে : 13
- মোহিত ব্যাপারী – সোনা রোদ্দুর : 14
- বিউটি পাল – বৃষ্টি : 14
- শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক – বর্ষা : 14
- বিপুল কুমার ঘোষ – কনক কাঁকন বৃষ্টি : 15
- কবিতা ধর – অব্যক্ত চাওয়া : 15
- কাশীনাথ সাহা – সায়ন্তনী : 15
- দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায় – বৃষ্টি ভেজা গোলাপ : 16
- তীর্থঙ্কর সুমিত – ভালোবাসার দেবালোকে : 16
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় – নীল ছাতাটা : 17
- মনোজকুমার মণ্ডল – নীল বেদনার ছিন্ন পদাবলী : 17
- রেজাউল করিম রোমেল – বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে : 18

CHITROKTI POTRIKA

- সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় – খোলা চিঠি : 18
- অনিমেষ রায় – প্রেম : 18
- গাজী আবু হানিফ – আষাঢ়ে বৃষ্টি পড়ে : 19
- নিমাই জানা – কিউমুলোনিম্বাস ও তিন কোণের বৃষ্টি : 19
- গোবিন্দ নাথ – আমি আর... : 20
- ঈশিতা পাল – বর্ষার মেঘমল্লার : 20
- শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় – প্রণয় টানে : 20

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

- অমল কর : সফদার হাসমি – স্রষ্টা ও সৃষ্টি : 21

ছড়া

- নন্দিনী সরকার – বর্ষা : 24
- গোপেন মণ্ডল – কালবৈশাখী : 24

গল্প

- তাপস মিত্র – ঝরা কৃষ্ণচূড়া : 25
- হারান চন্দ্র মিস্ত্রী – বিধবাদের নবজীবনের দূত : 26

প্রবন্ধ

- গোপাল বিশ্বাস – জনসাধারণের কবি নজরুল ইসলাম : 28

অনুবাদ কবিতা

- সঞ্জিতা সেন – আমাদের এই শীতের দিনগুলিতে : 31
- নীলাঞ্জন কুমার – নদীতো ফিরতে পারে না : 31

গ্রন্থ আলোচনা

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী – উদ্রিক্ত বেদনার হুতাশ ও নাস্তিকতা : 32

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

- গার্গী চট্টোপাধ্যায় – নবম শ্রেণি : 33

CHITROKTI POTRIKA

কিছু কথা

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত:
আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রি. মতান্তরে ৯৫০ খ্রি.–১২০০ খ্রি.)
মধ্যযুগ (১২০১ খ্রি.–১৮০০ খ্রি.)
আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি.–বর্তমান কাল)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো নির্দিষ্ট সালতারিখ অনুযায়ী সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাজন করা সম্ভব নয়। যদিও সাহিত্যের ইতিহাস সর্বত্র সালতারিখের হিসেব অগ্রাহ্য করে না। সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট যুগের চিহ্ন ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করেই সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্য নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে চর্যাগানগুলো নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থের নাম দেন " হাজার বছরের পুরনো বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা "। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। ইসলামি ধর্মসাহিত্য,পীরসাহিত্য,বাউল পদাবলি,পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ,মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্তপদাবলি, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, নাথসাহিত্য ইত্যাদি ছিল এই সাহিত্যের মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে মানুষ, মানবতাবাদ ও মানব-মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়: ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের সাহিত্য ও কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম, সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

কবিতা

আশিস সান্যাল
একদিন

আহ্নিকের আবর্তনে ভোর হয়
সবুজ শ্যামল ঘাসে ছড়ায় শিশির,
পাখিরা কূজনে মাতে
সাদা মেঘ উড়ে যায় দেখি পৃথিবীর।

পাহাড়তলির বনে দেখি সারাক্ষণ
একঝাঁক বুনোহাঁস
আলোড়িত করে সব শফেদার বন।
তখন তোমার কথা মনে পড়ে
রূপবতী হে নারী তোমাকে,
সর্বত্র ছড়ায় হাওয়া
বর্ণময় বৃষ্টি নামে শরীরের ভাঁজে
মনে পড়ে তোমাকেই হে নারী তোমাকে।

একদিন কাছে এসে বলেছিলে নারী
আমৃত্যু তোমাকে আমি যাব ভালোবেসে।
অথচ এখন তুমি আশ্চর্য আঁধারে
পড়ে আছ রিক্ত শূন্য
পৃথিবী সচল তবু ভিন্ন অভিসারে।
হারিয়ে যাবার আগে আজ মনে হয়
তোমাকেই সবকিছু দিয়ে যাব হে ধ্বনিময়।

রমেশ পুরকায়স্থ
যে যায় কী ফেরে আর

আমি তো অনেক কাল বসে আছি শূন্য আঙিনায়
ডাক বাক্সে শেষ চিঠি ফেলে
সদর চৌকাঠে হা-হা পাল্লা দুটি হাট করে খোলা
বসন্তের হাওয়া এসে অনেক পুরোনো গল্প
বলে গেছে কানে
অনেক আশ্বাস
তবু গোলাপি জ্যোৎস্নাই শুধু জানে
কত দুঃখ জমে মনে এক মধুমাস!

এক গ্রীষ্মে কত দাহ
এক-বর্ষা সিক্ত হয় কত ধারাপাতে
এক-শরৎ মুছে দেয় বুকের ভেতরে কত অমা
এক- শিশির জুড়াতে পারে কী সব জ্বালা
এক শীত গোপনে গোপনে লেখে
বুকের আকাশ জুড়ে কত হাহাকার!

যে যায় কী ফেরে আর, পথ শুধু চলে যায় দূরে!
স্মৃতি
সত্ত্বা
ভবিষ্যৎ
গৈরিক ধুলোতে পড়ে ঢাকা;
বসন্তের ডাক-পিওন কোনদিন দেবে না সে চিঠি।

CHITROKTI PATRIKA

পার্থ রাহা
রূপকথা

তোমার কাছে যাবো বলে
সেই কোন আদিম রাত্রিতে
আমার যাত্রা শুরু
সমস্ত অরণ্য সমুদ্র জনপদ নগর
আমার চোখের সামনে একাকার
একাকার
এখন বুকের গভীরে নীল শিরা উপশিরা
জটিল জটিলতর
সুন্দর নদীর মত
বারবার
পথ ভুল করায়

আজ রাতে তোমার আঙুলের স্পর্শে
আমার বুকের মধ্যে অনির্দেশ আকুলতা
তোমার শরীর আমার শরীরে
নতুন রক্তের জন্মে
অপার্থিব মুক্তির আনন্দ
এবং বিষাদ

স্মরণভূষিত মহাকাশের নীচে
মৃত্যু
তোমার বুকের গভীরে স্থির রূপকথা।

পঙ্কজ সাহা
মেঘ শতক

তুমি আর কোনোদিন ফিরে আসোনি,
এখন শিলংয়ের পাহাড়ের মাথায় মাথায়
মেঘ জড়িয়ে রেখেছে স্মৃতি,
পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে
যৌবনের গাঢ় সবুজ,
ঝিরি ঝিরি নদীর সুবাতাসে ফিসফিস
আমরা বলেছিলাম
নুড়িপাথরের মতো সে-সব কথা,
তারপর কবে হারিয়ে গেল
আমাদের দেখাশোনার পারাপার।

আমি নদীর এপার থেকে
তোমার ছায়া ঘাটের দিকে
ভাসিয়ে দিয়েছিলাম পাতার ভেলা,
কলাবতী ফুল ছিল তাতে,
হয়তো ভুল ছিল ক্ষণিকের।

আজ পাহাড়ের ঘূর্ণিপথে
আমি এক স্মৃতি-টিলায়,
ঝরনার অশ্রু ঝরে পড়ছে
কেন পৃথিবীর এই কোণে।

ছায়া মাঠ গাছের স্নেহ
মেঘ বিন্দু বৃষ্টি শরীর
হাওয়া তির অধীর কম্পন

আমি আজ ফিরেছি চেরাপুঞ্জিতে
কারা ধার করে নিয়ে গেছে
সেই সব মেঘ,
খিলখিল যে-সব মেঘেরা
একসাথে ভিজিয়েছিল আমাদের
আজ চেরাপুঞ্জিতে উদাসীন মেঘেরা
মাথার উপরে ছাতা
একটি মেঘও
আলিঙ্গন দিল না আমাকে,
আমি নিশ্চিত জানলাম
তুমি কোনোদিন ফিরবে না।

দীপক কর
সাশ্রু অস্তরাগ

দূর থেকে ভেসে আসা সকাতর ডাক:
এসো, একবার এসো
কত কথা রয়েছে বলার
কত অশ্রু টলমল
ঝরে পড়ার।

অঝোর কান্নার ঢল
দিশাহারা আমি
কী করে পৌঁছুই
ছেঁড়াপাল-তরি
টালমাটাল অতল।

দূর থেকে ভেসে আসা
বিষণ্ন বেহাগ
আনমনা মন
সাশ্রু অস্তরাগ।

কাজল চক্রবর্তী
গোধূলিপাখি

বিভাস হলো বর্ষার জল তোমার স্নেহে
বদলজলে একটি ছেলে মাখত কাদা
ভেজা বাতাস গন্ধ ছড়ায় দ্রোণপুষ্পের
আকাশ বুঝি আঁধারমগ্ন কালোচুলের

কাদা যত ধুয়ে গেছে, নেই কাছে নেই
পাতায় পাতায় গ্রন্থিময় সবুজ মালা
ওই মালাতে মুঠোয় ভরা প্রেমজ খই
প্রেমপদ্য অথবা গদ্য রাশপাতলা

জীবনকাহিনী শেষের পথে দ্রুতগামী খুব
বুকের ওপর রাখলে মাথা হয়ত আজও
শুনতে পাবে, আকুল স্বরে -- কোথায় তুমি?
সে স্বর পেরিয়ে বৃষ্টি এলে তুমিও ভেজো!
অনুরাগের মরমী ধুলোয় গোধূলিপাখি
গ্রীষ্মস্নাত শুকনো দাওয়ায় বসবে নাকি!

তেজেশ অধিকারী
প্রেমের কবিতা

(১)
ফুটপাত হাঁটে না
শুধু পাত পেড়ে বসে থাকে কারা?
সর্বহারা - সর্বহারা

একটু ফুটের জন্য হা-পিত্যেশ
আরো কারা - কারা?

(২)
আমার ভালবাসার নাম
আমি মুছে দিতে পারব না -
নিশ্চিত বিশ্বাসে জানি
এ আমার একমাত্র অহংকার ।

কালিদাস ভদ্র
বর্ষা

দিগন্তবিস্তৃত ও মেঘ
নেমে এসো আজ
সবুজে সবুজে ঢাকা
বিরহী ঘাসের উঠোনে

আঁধারভুক আষাঢ় আকাশে
পূর্ণিমা চাঁদ ভাসছে জ্যোৎস্নাভেলায়
উদাস বাতাস নাচছে
রজনিগন্ধা ফুলের মাদকতায়

বর্ষা তুই খোঁপা খুলে
ভাসিয়ে নে অভিসারীকে আজ

সালোয়ার কামিজে মগ্ন
শুষ্ক স্তন নিতম্ব গ্রীবা
বর্ষা তোর প্রতীক্ষা সাজায়---

গৌরী সেনগুপ্ত
কলির আত্মকথা

শিশির ঘাসে তবু আশ্বাস
আশ্বাস তুমি ফিরবে
ফের সবুজ অক্ষর লিখবে
আমার বিশ্বাসের গায়ে
সেই বিশ্বাসে মুখ তুলবে
ফলন্ত স্বপ্নবীজ
বাতাস মেখে মেখে সেই স্বপ্নরা
ঝড় হয়ে জাগাবে আমায়
অন্ধকার কোনো প্রকোষ্ঠ থেকে
সুরেলা আমি গাইব
কবিতায় স্বরলিপি বানাব
পাখির উড়ালে অমিত্রাক্ষর পড়ব

ভুলে যাব না
উজ্জয়িনীর রাতগুলোতে দিগ্বিদিকহীন
সেই চাঁদ চিলেকোঠায় অগোচরে।

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
পদ্যকাহিনি

পদ্যের পংক্তির প্রতি পদ পাঠে
মন্দ্রিত ছন্দের ধ্বনি বাজে বুকে
দ্যাখা যায় মেয়েটিকে নম্র রোগাটে
শুচি হাসে টোল খায় ফর্সা চিবুকে

কল কল করে কথা বলে বন্ধুকে
সবই যেন মনে হয় পদ্যেরই ছন্দ
কাছে এলে কথা এঁটে দ্যায় সিন্দুকে
ছড়িয়ে পড়ে তার কথার সুগন্ধ

একা একা একদিন একাদশী রাতে
পদ্য লেখার ছলে রাত জাগে কবি
সেই চোখ ভ্রূভঙ্গ আনত দৃষ্টিপাতে
আঁকে কবি প্রিয় সেই নারীটির ছবি

আবীর চট্টোপাধ্যায়
বৃষ্টি

সব শব্দ চারদিকে চলতে থাকে ধীরে
এমন করে বৃষ্টিপাতা সবুজ বিছানায়
সব কথাই জলের তোড়ে যায় সরে সরে
রাতভর চাওয়ার পথে জলের ধারায়।

পাগলের মতো ডেকে যায় পথের চিল
আকাশ চিরে ঝরোঝরো জলের ধারা নামে
উপচে ওঠে বাবলাতলায় খালের জল
ভেজা রাতের স্বপ্ন ভাসে ভরা বৃষ্টিখামে।

ফিরে যায় সকাল থেকে যত পথিকচারী
আবছা শরীর খালের পাড়ে বাসন মাজে
করবীতলায় গভীর প্রেমে আসন পেতে
কথার আগে শব্দ আসে রাখাল সেজে।

শশাঙ্কশেখর অধিকারী
ভালোবাসার কবিতা

রাত্রির শীতলতা যখন উষ্ণতা খোঁজে
তোমার বাগানে তখন দোয়েল ডাকে
কাঠমল্লিকা ফুলে আমি তোমার খোঁপায় বসন্ত সাজাই
আকাশ সমুদ্র ঝাউবন হাত ধরাধরি
করে পাশে এসে দাঁড়ায়

বেলাশেষের পাহাড় ক্রমশ রমণীয় হয়ে ওঠে
একবুক সমুদ্র নিয়ে তুমি তখন পূর্ণ অঝোর শ্রাবণ।

সাতকর্ণী ঘোষ
অপেক্ষা

আকাশ থেকে বৃষ্টি যদি না হয়
ভালোবাসার সৃষ্টি না হয়
তোমাকে বাসব ভালো
কি করে বলো

গুরুগুরু মেঘের আওয়াজ
যুদ্ধের কুচকাওয়াজ
ধোঁয়া ওড়ে না
বৃষ্টি ঝরে না
এই পোড়া দেহে প্রেম কি আসে
আগুন যে বড্ড ভালোবাসে

তবু বৃষ্টি আর বিশাখার ঝড়ে
ভয় ফেলে প্রেম দেব বুক ভরে

লিপিকা চট্টোপাধ্যায়
রোমন্থন

আবার যদি ফিরিয়ে দিতিস
পঁচিশবছর বুকে
বলিরেখায় রোদ লাগত
আত্মহারা সুখে।
সাদা কালোয় রং বোলানো
ভালোবাসার দাবি,
বৃষ্টি ফোঁটায় আঁকত একটা
ফ্রেমবন্দি ছবি।
চিলেকোঠার ঘনিষ্ঠতার
গন্ধ মাখা বাড়ি
চোখের পাতায় মেঘ ভাসাত
শেষ প্রবাহের তরি।
বদলে গেলে এ ঘরদুয়ার
উড়নচণ্ডী নেশায়
ইচ্ছেগুলো ওষ্ঠে লেগে
থাকত নতুন ভাষায়।
নকশিকাঁথার গল্পে
তেমন যাপন রেখে যাস,

জাপটে ধরে থাকবই
সেই ঝড়ের পূর্বাভাস।

জ্যোতি ঘোষ
কাচপোকার টিপ

ঝাড়লণ্ঠন চাই না, চাই না জলসা ঘরে আলো,
লেসার বিমের ওই ইন্দ্রজাল মিছেই কেন জ্বালো।

ভালোবাসায় নেইক ভুল, কাচপোকার সবুজ বরণ টিপ,
তুলসী তলায় রাখ জেলে মিঠে মৃদু স্নিগ্ধ প্রদীপ।

সব তো গেছে ভেঙে, চুরে, পড়েছ ধরা চটুল চপল ফাঁদে,
কোথায় ছিলে কোথায় যাবে, সোনার হরিণ আদৌ পাবে তাকে।
দানবীয় পুষ্পক রথ হায় সে জটায়ুর ডানা কাটা যাবে।

খোঁপাই নেই, জানো তো সেই,
মাধবী কোথায় তাকে গুজব,
পটলচেরা চোখের ভ্রূ পল্লবের আলোক,
গোলাপি দুই ঠোঁট সনে বউ কথা কও খুঁজব।
তারা ছিটানো ঝিলিক মারে জুঁইফুলের নোলক।

নীলাঞ্জনা হাজরা
বৃষ্টিস্নাত মধ্যরাতে

এক অসময়ে, চরম অসহায়ে
আমি বোধ করেছিলাম এক একাকীত্বের জ্বালা।
বর্ষার গভীর রাতে বজ্রপাত আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই শক্ত ঘাঁটি তে।
না কোন শত্রু ছিল না। কোন অস্ত্র ছিল না। কোন ঢাল দরকার ছিল না।
শুধু আমার অস্তিত্ব ছিল, বৃষ্টি স্নাত মধ্য রাতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
নিজের কাছে নিজের বোঝা বদ্ধ হয়ে বাকরুদ্ধ করে।
আমি মেঘের ভেতর ভেলায় করে
ভিজতে যাই।
ঘাট দেখা যায়।
তীর খুঁজে পাই।

সন্দীপ জানা
অব্যক্ত

ভেজা বৃষ্টির মিঠে-কড়া দহনে পুড়ছি এখন
পুড়তে পুড়তে সবুজের গায়ে কালশিটে দাগ
কালচে অশ্বত্থের পাতায় জমে জল, নাকি আবেগের ছাই?
হয়তো জমে কারও অব্যক্ত কথা
আমিও দাঁড়িয়ে থাকি কিছু একটা বলবার প্রত্যাশা নিয়ে
ভিজে যাই, ধুয়ে যাই, ধূলো-বালির সাথে পলি-
হয়ে আশ্রয় খুঁজি ধানের শেকড়ে
পলির ওপর পরতে পরতে জমে পলি
তোমার পায়ের ছাপ ঢেকে ফেলি;
রচনা করি তোমার সভ্যতার সমাধি

এসো সমাধির নীচে কথা বলি নীচু স্বরে
বৃষ্টি যেমন বলে যায় জানালার গ্রিলখানা ধরে
দীর্ঘ অনভ্যাস, কথাগুলো গেছে জমে
প্রয়োজন গলে যাওয়ার মতো একটু উষ্ণতা
এ-ভেজা দিনে তেমন উত্তাপ নেই
উনুন জ্বলেনি ঘরে, আগুন কোথায়?
মেঘের আঁচল সরিয়ে তাই রোদ্দুর খুঁজি
তাপে-উত্তাপে যদি হিমবাহ গলে নেমে আসে নদী
তার জলে ধুয়ে দিও আমাদের পুড়ে যাওয়া কথা-ছাই

শংকর ঘোষ
খোদাই

তোমায় দেখে দেখে দেখে দেখে
বাড়িতে ফিরেও মনের চোখে
দেখে দেখে দেখে দেখে
আশ আর মিটত না।
আমার টী শার্টে লেখা থাকতো
তোমার বলা কথাটা
আঁকা থাকত তোমার মুখ।

সময়ের চাকায় অনেকটা গড়িয়ে
ফুরসত পেয়ে উৎসুক চোখে
এইসব এখনও দেখা যায় কী না
যাচাই করতে প্রতিবেশীরা হাজির।

বললাম, ক্রমে ক্রমে সে ছবি
জামা ছেড়ে ভেতরে মনের গভীরে
বেমালুম সেঁটে গেছে।

ব্রততী চক্রবর্তী
কথার শিয়রে কথা

কথার শিয়রে কথা,
কথার পায়ের নীচে
আরও কিছু কথা
চোখের সাগর ছুঁয়ে
মৌনতার বর্ণমালা লেখে।
তুমি তো হৃদয় খুলে
মহাভারতের মতো
শব্দছবি এঁকে
উচিত ও অনুচিত
ধর্ম, অধর্ম কত
নিদান লিখেছ।
পেরেছ কি ক্ষ্যাপা বর্ষার
ঝড়ের তাণ্ডবগুলি
নিষেধ আঁচলে মুছে দিতে?
পেরেছ কি তপ্ত কপোলে
বৈশাখের নিদাঘ সন্তাপ
উচিতের স্রোতে ধুয়ে দিতে?
আমার রুমালে শুধু
ক্ষ্যাপা এক স্রোত বাঁধা আছে।
হাত ধরে ভাসি এস
জীবনের মহাকাল স্রোতে।

বীথি কর
আকাশ_ছোঁয়া

জানো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোমার কবিতার দুটো শব্দ হতে,
যে শব্দগুলো ছুঁয়ে জাগরণ ঘটে মনুষ্যমহলে!
নিতান্তই সামলে ওঠা মধ্যবয়স্কা নারীর ইচ্ছে জাগে কিশোরী প্রেমিকা হতে।
তোমার কলমের ফোঁটায় ফোঁটায় যে চন্দন কপালে কলকা এঁকে দিয়ে যায়,
আসন পেতে দেয় এই অভিজ্ঞ পৃথিবীতে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে কণ্ঠ ছেড়ে,
যদি সম্ভব হত কবি তবে ছিঁড়ে ফেলতাম সকল বাঁধন, সকল শিকল।
উন্মুক্ত করতাম আমার দ্বার তোমার লেখনীর আঁচড়ে জেগে ওঠা "নারী" বলে!
আর - একটু সামলে নিতে পারি না তোমায়, কবি?
আর - একবার বেঁচে উঠতে পারি না মৃত্যু থেকে?
আর - একবার তোমার বেণীমাধব এসে ছুঁয়ে দিতে পারে না আমায়!

বলো কবি, চুপ করে থাকার সময় এটা নয়!
কণ্ঠে ধারণ করার শব্দ দিয়েছ তুমি,
শুধু উচ্চারণ করার সাহস দাওনি বলেই,
আমিও আজ এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি।

সন্দীপ কুমার মান্না
গ্রহণ লেগেছে

ভালোবাসার বারান্দায় বৈশাখী ঢেউ
শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রত্যয়ী চুম্বন
বারেবারেই ডাক দেয় বশ্যতা স্বীকারে।
সুরঞ্জনা মন হিমালয়ের মতো নির্ভয়ী
অপেক্ষার অবসানে দেখা হয় হঠাৎই
হারিয়ে যাই গহীন গভীর অরণ্যে।
আগন্তুক বিজ্ঞাপনে নতজানু আমরা
রামধনু আকাশে দিল্লি কা লাড্ডু
রামধনু উঁকি দেয় নিতম্ব যুগলে।
ঊস্রি ধারায় আঁকা হয় বিনম্র মানচিত্র
লগ্নজাত মাধুরীতে আসে আত্মজ
গ্রহণ লেগেছে তোমার আমার চাঁদে।

শোভন বিশ্বাস
বৃষ্টির ফোঁটা

আষাঢ়ে শ্রাবণে প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা
আশ্বাসে ভরপুর কৃষকের প্রাণে
শ্রমিকের হাপরটানা শ্রান্ত পাঁজরে
যেন শীতল স্বস্তির ছোঁয়া
পাতায় পাতায় টাপুরে টুপুরে
ঝলমলে সবুজের প্রতিশ্রুতি
মন জুড়ে বন জুড়ে ফুটক হাসুহানা
আরও বৃষ্টি ঝরুক রুপালি ধারায়
কল্পমধুর ধ্বনি বাজুক
কবির নম্র হৃদয়ে।

মোহিত ব্যাপারী
সোনা রোদ্দুর

সকালের সোনা রোদ্দুর
তোমার কোমল পরশে স্নিগ্ধতা মাখা।
ভুবন জুড়ানো হাসিতে ভরে ওঠে মন।
প্রতি রাত্রির শেষে
নূতন দিনের আগমনী সুর বাজে।
সমস্ত ক্লান্তি অবসাদ মুছে দিয়ে
নূতন করে পথ চলা শুরু।
কোমল হতে, কঠিন হতেও জানো তুমি।
গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে তোমার রক্তচক্ষু
দ্বীপ্রহরে তীব্র কষাঘাত।
তোমার আলো আর রাগে ভিজে
সমস্ত দিন কাজ করে চলে কৃষকের দল।
ঘামে ভেজা শরীর অবসন্ন হয়ে আসে।
আবার ক্লান্তির মুক্তিও তুমি।
ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে
ধরনীর বুকে।
তোমার কোমলতা তোমার স্নিগ্ধতা।
তোমার সোনালী নিয়ন আলোয়
আদর সোহাগে ভরে ওঠে মন।

বিউটি পাল
বৃষ্টি

ঠিক যেমন করে জমাট কালো মেঘ
দখল নেয় আকাশের বৃষ্টি,
নামে গাছের পাতায়, পাখির ডানায়
টেলিফোনের তারে, চিলেকোঠায়,
মাটির বুকে_
ঠিক তেমনি একদিন হৃদয়ের
দখল নিল ভালোবাসা
আর তখন থেকে
বৃষ্টি আমার ভেতরে মুষলধারে

শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক
বর্ষা

অশ্বমেধের যজ্ঞে বাকি মহিষীরা এলেন না কেন দশরথ জানেন।

আমার দেহ পলাশ পায়নি!
শিশু শ্রাবণ হামাগুড়ি দেয় বেহুলার গর্ভে।
গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণচূড়াযুগ শেষ।

"এক মুঠো ভাত দিবি মা....ও মা দে না রে এক মুঠো ভাত!"

বাস্তুদেবতার মতো বর্ষা শুয়ে পৃথিবীর মাটিতে।

সমুদ্র গলি পেরলেই মহাহংস পাড়া,
বর্ষা ওখানে উপনদী।

দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্ম তুলছেন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে।

বিপুল কুমার ঘোষ

কনক কাঁকন বৃষ্টি

উদার আকাশ মোহিত করে
নীলাম্বরী সাজে,
প্রাণসজনী সে যে আমার
ব্যাকুলতার মাঝে।

বর্ষাতে সেই আকাশ জুড়ে
খেলে বাদল মেঘে,
তবু থাকে প্রিয়ার বুকে
ভালোবাসা জেগে।

ভালোবাসার কুচি যখন
বৃষ্টি হয়ে ঝরে
টাপুরটুপুর নূপুর ধ্বনি
বাজে প্রাণের পরে।

বৃষ্টি আমার কনকপ্রিয়া
যেন মনের রাধা,
উতল হাওয়ায় বাঁশির সুরে
মানে নাতো বাধা।

তারই মাঝে মেঘের মাদল
বাজে দ্রিমি দ্রিমি,
প্রিয়া হয়ে বাজায় কাঁকন
বৃষ্টি রিমিঝিমি।

কবিতা ধর

অব্যক্ত চাওয়া

তোমার পৃথিবীতে যখন
বিকেলবেলায় কোকিল ডাকে,
আমার পৃথিবী তখন
রোজ সকালে উঠে যুদ্ধে যায়।
তোমার পৃথিবীতে যখন
পাতা ঝরার সময়,
আমর পৃথিবী তখন
বৈশাখের অভিমানে পুড়ছে।
তোমার পৃথিবীতে যখন তুমি
ভালোবাসা চাইলে বৃষ্টি নামে,
আমার পৃথিবী তখন
এক টুকরো মেঘ ছুঁয়ে ভেজার স্বপ্ন দেখে।
আসলে সবার পৃথিবীই তার নিজের মত।
তাই বলে কি আমার আর তোমার প্রেমে পড়া বারন।

কাশীনাথ সাহা

সায়ন্তনী

সমস্ত অক্ষর জুড়ে তোমার অদৃশ্য বন্ধন।
জ্যোৎস্না রাতের প্লাবিত আলোয় তোমার নির্নিমেষ আহ্বান।
কতদূরে যাব আমি
কোনখানে তোমার অভিকর্ষ টান।
আমি বাতাসের আড়াল সরিয়ে
তোমাকে খুঁজেছি।
বুভুক্ষু চিতার আড়ালে দেখেছি তোমার প্রলম্বিত ঢেউ।
সংসারের প্রথাগত আড়ষ্টতা ভেঙে
ছুঁয়েছি তোমার কবিতাময় গ্রীবা।
সায়ন্তনী আমি পুনর্জন্ম চাই
আলোছায়া শালবনে নির্জন প্রহরে
আমি কাটাবো সময়।
ধানক্ষেতের সবুজ আবাহনে আমি তোমার সাথে হারিয়ে যাব
দিকচক্রবালে।
মন্দিরের ঘন্টাধ্বণিতে আমি আমি তোমার ওষ্ঠে ছোঁয়াবো
প্রথম চুম্বন।
আজানের সুরে ছড়ানো অক্ষর খেলায় আমি লক্ষ্যভেদে স্থির থাকবো
তৃতীয় পান্ডব।
আমি জ্যোৎস্নায় প্লাবন ছুয়েছি
মেঘমল্লারে শুনিয়েছি আর্য মহিমা।
অপরাহ্নে অমরত্বের পাঠ নিয়েছি
তোমার করতলে।
সমুদ্রের কাছে নিয়েছি আদিম প্রবাহ।
সায়ন্তনী দীর্ঘস্থায়ী পুড়বো এসো
অমরত্বের সান্ধ্য বৃষ্টিপাতে।

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়
বৃষ্টি ভেজা গোলাপ

একটা কালো গোলাপ, দুঃখের কথা বলে,
একটা রক্ত গোলাপ উন্মাদনায় উন্মত্ত।
সাদা গোলাপ শান্তির কথা বলে,
কালো চুলের ফাঁকে গোলাপী গোলাপ, শিল্পীর তুলির টানে অনবদ্য।
গোলাপ পেয়ে সারাদিন আশার কথা ভাবি!
বৃষ্টির সকালে টবে ফোটা গোলাপ ভিজে স্নাত!
আদরের তুলোর পাখি আর প্রজাপতির, ছোটাছুটি খেলা।
কখন বেলা শেষ হয় কে জানে?
তখন তোমার অভিমান হয়, আমি আনমনা হই।
মল্লার রাগে কে যেন গান গায়,
তোমাকে ডাকব ভেবেও,ডাকা হয় না !
তোমাকে আর একবার কালো মেঘের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছি,
ডাকিনি!
বৃষ্টি ভেজা গোলাপ হাতে ঘোড়ায় চড়ে আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর অনাদিকাল ধরে ছুটছে,
বিদ্যুতের চমকে একঝলক দেখে আশ মেটে না,
ডাকতে গিয়েও ডাকা হয়ে ওঠে না।।

তীর্থঙ্কর সুমিত
ভালোবাসার দেবালোকে

স্তম্ভর ওপর আরো কতগুলো স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে
দারুন অনিচ্ছায় একটা বটগাছ দুলছে
হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
নিঃসর্গ ও মানুষ অঙ্কনচিত্রে ক্রমশ বদলে যায়
অক্ষম শিলালিপি ক্লান্ত হয় পথে পথে
ধারাবাহিকতার পরিবর্তন সূচিত হয়
আঁকার সাদা পাতায়
দীর্ঘদিন পরে আরো কত নীরবতা ভেঙে
নিজেকে অটুট রেখেছি 'কবিতা' র কাছে
এইভাবে একদিন পৌঁছে দেবো অনিচ্ছার মানবজন্ম

ভালোবাসার দেবালোকে।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
নীল ছাতাটা

নীল ছাতাটা নিয়েই বেড়ুলাম আজ
কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে
তুমি ও তো বেরিয়েছো....।
এলোমেলো হয়ে আছে আকাশ,
এখন আবার জুলাই মাস
ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টি পড়েই চলেছে,
অনেকটা পথ যেতে হবে, তবে দেখা হবে তোমার
আমার। কতকাল হলো এভাবে চলা...,
পায়ের চটিগুলো নোংরা জলে ভিজে যাচ্ছে,
ট্যাকসির দুরন্তপনায় ভিজিয়ে দিল শাড়ীটা, ইস!
কখনো, বর্ষায় বাবাই ছাতা ধরতো মাথায়,
নেই এখন সে, বহুদিন পর মনে পড়ে গেল তাকে।

মনোজকুমার মণ্ডল
নীল বেদনার ছিন্ন পদাবলী

(১)
নীল আকাশ আর অতল দীঘি
দুটোই ছিল তার দু' চোখে ।
আজ সেখানে রুক্ষ মরু
সর্বনাশের অতল শোকে।

(২)
হৃদয় মরুর তৃষ্ণা নিয়ে
পান করেছি নষ্ট জল।
শূন্য বুকের দহন জুড়ায়
আকন্ঠ সে নীল গরল।

(৩)
তুমি স্বপ্ন দেখালে আমি আকাশ ছুঁতে পারি
দুচোখের ঘৃণা তোমার- এ হৃদয়ে বিদ্ধ তরবারি।

(৪)
অনিষিক্ত ভালবাসা একদিন মরে যায়।
ভালোবাসাহীন জীবন দুঃসহ;
নিঃশেষিত হৃদয় তখন বিদীর্ণ যন্ত্রণায়!

(৫)
দুঃখ নদীর জলটুকু থাক একলা আমার,
সুখ সরোবর তোমারই হোক
সাঁতার কেটো মনের সুখে।

CHITROKTI POTRIKA

রেজাউল করিম রোমেল
বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে

আজ বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে
মনে পড়ছে তোমার কথা।
এমনি এক বর্ষার বৃষ্টি-তে
ভিজেছিলে তুমি।
ভিজেছিলাম আমিও...
কতদিন সে মুখখানি দেখি না।
এই বর্ষার বৃষ্টিতেই
তোমার সাথে আমার হয়েছিল
প্রথম দেখা।
তুমি বলেছিলে-ভাল আছেন?
আমি বলেছিলাম-হ্যাঁ ভাল, আপনি?
তুমি বললে-ভাল আছি।
আসুন বৃষ্টিতে ভিজি।
তোমার সাথে ভিজে ছিলাম আমিও।
তারপর মন দেয়া নেয়া।
পুরোনো সেই সুখ স্মৃতিগুলো আজও
বুকের সুরে সুরে বাজে।
বর্ষার বৃষ্টি-তে ভিজেছিলে তুমি,
ভিজেছিলাম আমিও...

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
খোলা চিঠি

বৃষ্টি, তোমার কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে।
তোমার সঙ্গে কতদিন হয় না দেখা।
সেই মনে আছে,
প্রথম তুমি আমায় দেখা দিয়েছিলে স্বপ্নে।
তোমার সেই স্নিগ্ধতা আমার মন ভুলিয়েছিল।

সেদিন ছিল এক আষাঢ়ে রাত।
তোমার সে কি রূপ!
সেদিন সারাটারাত আমি
এক মুহূর্তের জন্যও স্থির হতে পারিনি।
লমনে হচ্ছিল, এ যেন
সাক্ষাৎ এক তরুণীর জীবনের চূড়ান্ত অপ্রাপ্তির অভিমান।
কিন্তু আমি সেদিন তোমায় অবহেলা করেছিলাম।
কিছুটা না- বুঝে, আর কিছুটা আমার উদাসীনতায়।

আজ এতবছর কেটে গেছে।
বৃষ্টি তুমি কি এখনো তেমনি করুণভাবে ঝরো?
বৃষ্টি, আজ আমি বড়ো একা।
আমার এই চিঠি তুমি পাবে কিনা, জানি না।
তবে যদি পাও, উত্তর দেবে, আশা করি।
তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব।

ইতি তোমার নীল

অনিমেষ রায়
প্রেম

ঝাউবনের সাঁই সাঁই
ঝড়ো হাওয়া আমার প্রেম।
বালিছাদ থেকে সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়ি উপত্যকা থেকে
চড়াই উতরাই।
শাড়ির আঁচল থেকে
পাহাড়ি পোশাক প্রত্যাখ্যানের
প্রত্যাশিত প্রেম।
কাব্যিক নারীকে অনায়াসে
সাজাতেই পারি স্বপ্নে-জাগরণে।

গাজী আবু হানিফ
আষাঢ়ে বৃষ্টি পড়ে

আষাঢ়ে বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর-ঝরঝর-শুভ্র আকাশখানি
নেইকো পাখির ডাকাডাকি,নেই হাওয়ার বহমানতা;
কেবলই ঝরে পড়ে নিরিবিলি-ছন্দেবন্ধে অবিরাম দিনমান
মাঠে মাঠে নীলোৎপল হাসে জলের সিপ্‌ফনিতে ঢেউয়ের মৌণতা।

উগলিবিগলি বয়ে চলে নদী- চলায় দীপ্ত তারুণ্যতা
রূপ তার পঞ্চবিংশ নারীর তুখর উন্মাদনার প্রকাশ;
জলে জলে সিক্ত সবুজ সতেজ করে তোলে তার প্রাণ
বৃক্ষ কানন জুড়ে কত না আনন্দের জাগ্রত উচ্ছাস।

নীলাচলে উড়ে চলে সফেদ মেঘমালা-আবছায়া প্রকৃতি
স্নান করে ঝর্ণাধারায় সাগর নন্দিনী-ভূপতিরও ভিজায়ে বদন;
কত না সুনসান তরুকুলেশ্বর পরতে পরতে হরষে বরষে
আকাশ হতে আসে মেঘপরিদল পাখায় পাখায় ছড়ায়ে স্যন্দন।

বাংলার কোলে কোলে ফুলে ফুলে করে উজ্জল আলোর নয়ন
এইতো চলেছে হেথা কত যুগ কাল-কত না গ্রহ করে পার;
এখানেই তুমি আমি আছি চিরকাল-যুগ জন্ম শিশুর মতন
ভিজে ভিজে মিষ্টি লাগে উষ্ণ শরীর-বৃষ্টিকে মনে হয় যেন উপহার।

নিমাই জানা
কিউমুলোনিম্বাস ও তিন কোণের বৃষ্টি

কিউমুলোনিম্বাস পরকীয়ার মতো অসংখ্য জাভেলিন কৃষ্ণকায় নক্ষত্রেরা তিনদিনের অভুক্ত কালো মেঘ থেকে নিজের নাভি রক্ত বের করে রাইবোজোম বৃষ্টিপাত ভিজিয়ে

১৮৯ ডিগ্রির পর পূর্বাভাস কথাগুলোই ক্রমশ ভূমধ্যের আধ্যাত্মিক হয়ে যায়, রাতের সাংখ্যমান গুলো কখনোই এক নয়
আমি যমুনার তীরে দাঁড়ানো হাজারো গোপীগনের সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দেহ খুঁজে বেড়াই বিবিধ চৈতন্য উপাচার দিয়ে,
কেবল রক্তাক্ত ঠোঁটে তিনটি পলাশের অনন্তলোকের সায়াহ্ন চিহ্ন রোপন করি, বৃষ্টি মানেই শুধু আগুনের লেলিহান নয়
এক যৌন সঙ্গমের প্রাচীন ক্ষেত্র ভূমিকে যাপন করি প্রতিবন্ধী চিরহরিৎ গাছতলায়, আমার কোন কর্কট কন্ঠস্বর নেই
আমার দাঁতের কাছে একটি ছত্রাক তার খোলস পাল্টে যায় পূর্ণিমা নক্ষত্রের মতো, সব জায়গায় একটি যৌন সম্ভোগ কথা লুকিয়ে থাকে সাপেদের কর্কট কান্তি ছুঁয়ে এক পশলা স্নান সেরে যমুনায় নামার পর, কোকিলের আওয়াজ প্রায় মৃত

কালো মেঘের ভেতর নাভি ও নক্ষত্র খুঁজে বের করে চলি ত্রিকোণ পিটুইটারির মধ্যরেখা

গোবিন্দ নাথ

আমি আর...

বেলা এগোচ্ছে একটু একটু করে পশ্চিম পাটে
নিস্তব্ধ, শুনশান, জনমানবশূন্য
একখণ্ড পৃথিবীর অধিকার।
পাখিরা উড়ে যায় যে যার আঙিনায়।
যেদিকে তাকাই সবুজের এক ভারী সীমারেখা।
বিস্তীর্ণ একটা সাম্রাজ্য।
আমি ডেকে নিলাম তোমাকে।
তুমি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলে।
নির্জনতার গন্ধ মেখে পড়ন্ত বেলা
প্রহর গুনছে বেলাশেষের পাহারায়।
সন্ধ্যাতারার নিশানা মিলেছে
ওই দূর আকাশের কোণে।
সেও একা, আমরাও একা।
আস্তে আস্তে আঁধার চেপে বসছে
প্রকৃতির এপাশে-ওপাশে।
সন্ধ্যাতারাটা আরও জ্বলজ্বল করছে।
পা দুটো নিথর হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে।
পাশে শরীরের স্পর্শ দিয়ে হাতে হাত রেখে
এগিয়ে চলেছি আমরা।
রাস্তার ধুলোগুলো পা জড়িয়ে ধরছে।
নিশ্চিত আহবানে এগিয়ে
পরস্পর নির্বাক দুটো প্রাণী
আমি আর...

ঈশিতা পাল

বর্ষার মেঘমল্লার

নিঃসঙ্গতার ছাই ভাসিয়ে দিয়ে বর্ষা নেমেছে,
আজ আমার ঘরে বঁধূ এসেছে-
অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা খসে পড়েছিল,
আজ চোখের কোণে অপেক্ষার কালি জমেছে।
তবু গাল ছুঁয়ে যাওয়া কষ্টের নদী থমকে গেছে,
আজ যে আমার ঘরে চাঁদ উঠেছে-
ঝরঝরঝর বৃষ্টি হৃদয়ের দুকূল জুড়ে,
অনেক লুকনো ধৈর্য্যরা সব বাঁধ ভেঙেছে।
আবার সেজেছে সন্ধ্যেগুলো জলসাঘরে,
জানলার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা আঁকছে প্রেম-
বৃষ্টিস্নাত আঙুলের জাদু তানপুরাটায়,
সুরগুলো সব মাতাল হয়ে মেঘমল্লার গাইছে।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রণয় টানে

চাইলে তুমি আগুন হয়ে ছোঁব
খরস্রোতায় বাঁকবে গতিপথ
পাহাড়প্রেমিক সাঁতরে আষাঢ় পাবে
শরীরজুড়ে নোনা স্বাদের ক্ষত ।

শুকনো সময় বিষম খেল আজ
আস্ত একটা দিন ফুরাল শেষে
পুরাণপাটায় দুঃখ ভোলার পণ
তোমার আকাশ নদীর গায়ে মেশে ।

এঁটো প্রণয় শিস দিয়ে যায় কানে
বন্ধ চোখে তৃপ্তি মাখা সুখ
কংসাবতী লেপটে থাকে বুকে
এবার তোমার ভরা সবুজ মুখ ।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

অমল কর

সফদার হাসমি – স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আরবি ভাষায় সফদার অর্থ নির্ভীক। সফ অর্থ সৈন্যের সারি, দার মানে ভেদ করা। শত্রুসেনার সারি ভেদ করে যিনি নির্ভীকভাবে এগোতে পারেন, তিনিই সফদার।

সফদার কোনো প্রখ্যাত খেলোয়াড় বা চলচ্চিত্রের নায়ক অথবা কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মানুষের মধ্যে বহু আশ্চর্য মানুষের সমষ্টির সম্মিলন। তিনি বহুভাষীর অনায়াস অধিকারী, কবি, সাংবাদিক, অধ্যাপক নাট্যকার, নাট্ককার, অভিনেতা, পরিচালক চিত্রশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, চিত্রনাট্যকার, স্বল্পদৈর্ঘ্যের খেতাবজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রবুদ্ধ চেতনার প্রতিভূ, প্রগতিশীল সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রোজ্জ্বল অংশীদার, প্রতিবাদী প্রতিরোধী প্রতিস্পর্ধী এক উদ্দীপক প্রেরণা। তিনি এক কল্যাণচিন্তক বিশ্বচিন্তক মানবতাপ্রেমী প্রভুসমাজের চিরায়ত ও দুরপনেয় শোষণ-শাসন দুষ্কর্ম-অপরাধের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত চিন্তা- চেতনার ব্রতমনস্ক ও মৃত্যুঞ্জয়ী মনুষ্যত্ব। সফদার শৈশবে আলিগড়ে এবং পরে দিল্লিতে পড়াশোনা করেন। ১৯৭৩ সালে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক হন এবং ১৯৭৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। তিনি দিল্লি কলেজ, গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর কলেজ ও জাকির হোসেন কলেজে অধ্যাপনা করেন।

কলেজে পড়াকালীন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও ১৯৭১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর প্রিয় নাট্যদল জননাট্য বা জনম।
১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের তথ্যসচিব হিসাবে চারবছর দায়িত্ব পালনের পর ইস্তফা দিয়ে মার্কসবাদ বীক্ষায় দীক্ষিত সফদার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সারাক্ষণের কর্মী হিসেবে যোগ দেন

দেশ-রাজ্য যখন মতলবি হাওয়ায় ধ্বস্ত, যেখানে ধর্ম খায় মানুষকে, প্রতিকণায় যেখানে উৎকোচের গন্ধ, যেখানে প্রতি আলিঙ্গনে বাঘনখ লুকানো, প্রত্যঙ্গবিহীন খিঁচুনিতে গোঙায় যেখানে দিনকাল, বিকারগ্রস্ত অর্থনীতি বিকলাঙ্গ প্রেতের মতো যেখানে শোভা পায়, দুর্বৃত্তিই যেখানে স্বাভাবিক বৃত্তি,খিদে শুধু নয়জঠরের সাথে জরায়ু ছিঁড়ে মরা মেয়েদের হাহাকারের করুণ গল্প যেখানে, মেয়েচিহ্নধারীর বিক্ষত গোপনাঙ্গের রক্তাক্ত আঁশটে গন্ধ যখন জীবন্ত পোড়ায় মানুষের সমবেত ঘৃণার আগুনে যদি শপথে শপথে

মন্ত্রপূত করা যায়, লেলিহান আগুনের মতো ছড়িয়ে যায় শপথের লহরআজও সেখানে সফদার অত্যন্ত বর্ণময় অর্থবহ প্রাসঙ্গিক।

দেশ কাল সময় মানুষ সমাজ জীবন রাষ্ট্র সাহিত্য সংস্কৃতি মানবাধিকার রক্ষার এবং সত্য প্রেম জ্ঞান সুন্দর সুস্থতার সুসমঞ্জস মান প্রতিষ্ঠার উদ্দীপক প্রেরণা, নির্ভীক প্রহরা ছিলেন সফদার।যখন উচ্ছিষ্ট হাতড়ে বেড়ায় জীবন, যখন কোনো শপথ খুঁজে পায় না পথ,মানবতার মৌল সত্যে সফদার হয়ে ওঠেন এক নিবিষ্ট সৃজক।কবি পূর্ণেন্দু পত্রী-র যথার্থ বিশ্লেষণ ''সফদার মানে জাগা, জেগে থাকা , জাগানো"। সফদার সমস্ত সমাজকর্মী-সাহিত্যকর্মী-সংস্কৃতিকর্মীর কাছে ব্রত, প্রার্থনা। তাঁর জীবনচর্চা সমাজ বদলের কাঙ্খা শুধু পথপ্রদর্শক নয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়ও। সফদার হাসমির জন্ম ১২এপ্রিল ১৯৫৪, দিল্লিতে। তাঁর বাবা হানিফ হাসমি।মা শিক্ষিকা কমর আজাদ হাসমি। বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পরিচালক ও বর্তমানে জননাট্য মঞ্চের সভানেত্রী মলয়শ্রী (মালা রায়) হাসমি তাঁর স্ত্রী।

সবদেশে সবকালে নতুন জীবনবেত্তায় যাঁরা কৃতবিদ্য, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নদর্শী, সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী_দেশের শাসকশ্রেণি কায়েমি স্বার্থে, প্রাণোচ্ছল এসব মানুষকে কয়েদ করে নির্মম হত্যা করে।জিশু, সক্রেটিস, ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলি, পারসনস,পাইক,লোরকা, জুলিয়াস ফুচকি, রোজেনবার্গ দম্পতি, হোসে মার্তি, পাবলো নেরুদা, চে গেভারা, বেঞ্জামিন মোলায়েজ, কডওয়েল, মুনীর চৌধুরী, ভগৎ সিং, সোমেন চন্দ, সরোজ কায়সার, ব্রজলাল এবং সফদার হাসমি তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সময় সোভিয়েত রাশিয়ায় পথনাটকের সূচনা হয়। বিপ্লবের প্রথমবর্ষ পূর্তি উৎসবে সেবোর মায়ারহোল্ড কবি মায়াকোভস্কির "মিস্ট্রিওয়াফ" (রহস্যময় ছলনা) নাটকটি হাজারো দর্শকের সামনে মস্কোর লাল চকে মঞ্চস্থ করেন এবং দর্শকের জনপ্রিয়তা পায়। পরে কারখানার গেটে, বাজারহাটে, পথপ্রান্তরে নাটকটি প্রিয়তা পায়। চিন দেশে ১৯২০ সালে পথনাটকও জনপ্রিয়তা পায়। লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেটবৃটেন, গ্রিস, আমেরিকায়ও পথনাটকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভারতে আইপিটিএ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) আর্থিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে এই পথনাটককে ব্যবহার করে। ধ্রুপদি ললিতকলা ও পথনাটকের তফাত হল, পথনাটকে জমকালো পোশাক আলো রং ইত্যাকার চাকচিক্য বর্জন করে ভরত মুনির চেয়ে ব্রেশটের নাটকের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।উৎপল দত্ত বাদল সরকার আশিস দত্ত যেমন_সফদার হাসমিও পথনাটকের শৈলীতে জনম নাট্যদল তৈরি করে নগরে শহরে গঞ্জে মঞ্চে শ্রমিকবস্তিতে কারখানায় অসংখ্য নাটক অভিনয় করেন। হাসমির পাণ্ডুলিপি গান এসব নাটকে সংযোজন করেছেন। দিল্লিতে বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে সফদার নিবিড়ভাবে যুক্ত হন।

১৯৮৯ সালের ১ লা জানুয়ারি দিল্লির পুরসভার নির্বাচন উপলক্ষ্যে বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে সিআইটিইউ-র আহ্বানে দিল্লির অদূরে সাহিবাবাদে সফদারের পরিচালনায় জননাট্য মঞ্চের 'হল্লা বোল ' পথনাটক মঞ্চায়নের সময় কংগ্রেসের গুন্ডা মুকেশ শর্মার নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত নাট্যদলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলে সফদার প্রবল লাঠিপেটা পেরিয়ে দলীয় কর্মীদের রক্ষা করতে পারলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। রামবাহাদুর নামে একজন শ্রমিক গুন্ডাদের গুলিতে নিহত হন। মস্তিষ্কের আঘাতে প্রবল রক্তক্ষরণে সফদার পরেরদিন শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

যে পথনাটক নিয়ে সফদার মানুষের কাছে মানুষের হয়ে জনমঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, নিজের জীবন আহুতি দিয়ে তিনি পথনাটককে আজ গোটা ভারতের গ্রাম নগর বস্তিতে পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পথনাটকই হয়ে ওঠেছে আজ জনচেতনা বৃদ্ধির প্রকৃত কলামাধ্যম, শাসকশ্রেণির মদতপুষ্ট প্রযুক্তি-সংস্কৃতির একমাত্র বিকল্প হাতিয়ার হিসেবে। সফদারের নাট্যশহিদ হবার পর ১৯৮৯ সালে প্রায় ৩০ হাজার পথনাটক অভিনীত হয়েছে সারা দেশজুড়ে। সফদারের জননাট্য (জনম) মঞ্চ অভিনীত পূর্ণাঙ্গ নাটক: মৃত্যুর অতীত, বকরি, ভারত ভাগ্যবিধাতা, ভয়াজক, যব ফিরিঙ্গি লোট আয়ি, ডাহকতে লেনা, মোটেরাম কা সত্যাগ্রহ।

সফদারের জননাট্য (জনম) অভিনীত পথনাটক: জনতা পাগল হো গই হ্যায়, ডিটিসি কি ধান্দলি, মেশিন, গাঁও সে শহর তক, হত্যারে, আওরত, তিন ক্রোড়, রাজা কা বাজা, মিল কর চলো, আয়া চুনাও, সমরথ কো নহি দোষ গোঁসাই, পুলিশ চরিত্রম, কালাকানুন, ইশারা, বীর জাগ পরা, জংকা খতরা, মে দিবস কি কাহানি, অব চাক্কা জ্যাম, এগ্রিমেন্ট, হল্লা বোল, অপসারণ ভাইচারেকা।

সফদার হাসমির অভিনীত-নির্দেশিত নাটক: দরবার, কিমলিশ, দ্য একসেপশন অ্যান্ড দ্য রুল, ইন সার্চ অফ জাস্টিস, অরফ্যান অফ ক্যাওস।

সফদার হাসমি পরিচালিত চলচ্চিত্র: খিলতি কলিয়াঁ (২৪ এপিসোড) _ইউনেস্কো, Banned Drugs, মিরাট বিদ্রোহ।

সফদারের নাট্যশহিদ হবার পর ৩৩ বছর পার, বেঁচে থাকলে সফদারের বয়স হত ৬৮ বছর। আজও এখনো সফদার একজন অমলমানুষ হিসাবে সকলের প্রিয়জন ও জনপ্রিয়। সফদার "ওঠো, জাগো" বলে ডাক পাঠানো চৈতন্যের এক নাম _ তাঁকে শ্রদ্ধার অজস্র আবির মাখালাম।

ছড়া

নন্দিনী সরকার
বর্ষা

বর্ষা তুমি এমন কেন পথ ভোলানো?
বর্ষা ছাতায় যখনতখন জল ঝরানো!
বর্ষা জলে পা ছপছপ হাতেই চটি,
বর্ষা ঘরে মজার খেলা লুডোর ঘুঁটি।

বর্ষা মানে ইলিশ মাছ আর ঝাল খিচুড়ি
বর্ষা গরম পাঁপড় ভাজা মশলা মুড়ি।
বর্ষা মানে রেডিয়ো শোনা ওই গো শ্রাবণ
বর্ষা হল জল থইথই ভরা উঠোন।

বর্ষা এলেই পেখম তুলে নাচবে ময়ূর,
বর্ষা হলে ব্যাঙের ডাকে ভরবে পুকুর।
বর্ষা এলে ছাদে ভেজে এক বুড়োকাক
বর্ষা দেখে প্রেমিক ভাবে অপেক্ষা থাক।

বর্ষা মনের বেদন বাড়ায় রবির কথায়
বর্ষা আনে কান্না কেন অঝোর ধারায়?
বর্ষা যেন মনের ভেতর গহীন সে দুখ
বর্ষা তুমি ভরিয়ে তোলো সব খালি বুক।

গোপেন মণ্ডল
কালবৈশাখী

ঝড়ো বেগে বইছে বাতাস
উড়িয়ে পথের ধুলো,
ক্রমশ বেগে সো সো রবে
কালবৈশাখী এলো।
গাছ গুলি সব নুইয়ে মাথা
এদিক ওদিক দোলে,
কুজন ভাঙার শব্দ শুনি
গাছের ডালে ডালে।
শুকনো পাতা এধার ওধার
ডিগবাজি যেনো খায়,
পশু পাখি ভয়েতে খোঁজে
স্বস্তির আশ্রয়।
কালো মেঘের গর্জন শুনি
বজ্রের আনাগোনা,
ঝড়ো পবনে বারি ধারা ঝরে
কিছুই যায়না শোনা।
ভেঙ্গে পরে যত দুর্বল গাছ
কেপে ওঠে যত ছাউনি,
চারি ধারে শুধু বিকট শব্দ
গেলো গেলো রব শুনি।

গল্প

তাপস মিত্র
ঝরা কৃষ্ণচূড়া

জীবনভর শুধুই মিথ্যে কথা বললে। একদিন অন্তত একটা সত্যি কথা বল। বিষরাট বুঝল আর বাড়িতে থাকা যাবে না। যতক্ষণ থাকবে বকে যাবে। আর বকতে বকতে কুড়ি বছর আগে বিয়ের পরে কি বলেছিল সেইসব কথাও টেনে আনবে। বলিহারি যাই স্মৃতিকে!

ব্যাগ হাতে দেখে বুঝল বাবু বাজারে যাচ্ছেন। আর বাজারে গেলে কখন যে ফিরবেন তার ঠিক নেই। বক্তব্যের আর - একটু ধার বাড়িয়ে বলল, দেখে যেতে হবে তো কি কি বাজার থেকে আনতে হবে! না কি আমি যাব গতর দেখাতে!

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিরাট রান্না ঘরের ঝুড়িতে রাখা সবজি দেখল। কাঁচা লঙ্কা নেই, বেগুন নেই। ফ্রিজের মধ্যে একটাও পাতিলেবু নেই।

কলতলা থেকে জামা কাপড় কাচার শব্দ আসছে। কাছে গিয়ে দেখল রান্না ঘরের একরাশ তেনা কাচতে বসেছে। কতক্ষণ ধরে চলবে কে জানে! সুতরাং এসব দেখে সময় নষ্ট করার মানে হয় না ।

পথে কুসুমের সঙ্গে দেখা। দু দিনের জন্য বাপের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটা ঠিক আগের মতোই আছে। দেখতে পেয়ে দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছো বিরাটদা? একেবারে বিছানা বন্দি! না কি একটু -আধটু রোদ্দুর এখনো মাখো। গলায় পুরনো সুর। রাস্তার দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগছিল না। কুসুমই বলল, ওই প্রাইমারি স্কুলটার পিছনের মাঠটাই বসি চলো আগের মতো ।

কৃষ্ণচূড়া গাছটা ফুলে ভরে গিয়েছে । একরাশ ঝরা ফুল ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে ।

হারান চন্দ্র মিস্ত্রী
বিধবাদের নবজীবনের দূত

একদিন সন্ধ্যায় মাদুর পেতে লম্ফ জ্বেলে বই পড়তে বসেছি। বড়দা আমার পাশে এসে বসল। পড়ার সময় কেউ পাশে থাকলে আমার পাড়ায় বিঘ্ন ঘটে। কারণ আমি সরব পাঠ করি। কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করার জন্য আমি বললাম,"কিছু বলবে দাদা?"
দাদা বলল,"তোর পড়ার অসুবিধা হচ্ছে জেনেও এখানে বসেছি। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস। হাসি মিলিয়ে গেছে।"
আমি বললাম,"তুমি কি করতে চাইছ?"
"মিনতির মামা একটি ছেলে দেখেছে। দিন মজুরি করে খায়। মিনতিকে বিয়ে দিলে কেমন হয়?" বলল দাদা।
"বাড়ির অন্যদের মতামত কি? তোমার কি ইচ্ছা?" জিজ্ঞাসা করলাম।
দাদা বলল,"আমি কি করব বুঝতে পারছি না। বাড়ির অন্যদের জানানো হয় নি। তার জানলে হয়তো বিয়ে হতে দেবে না। শুধু তোর মতামত জানা খুবই প্রয়োজন।"
আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। রাজা রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরার থেকে বাঁচিয়েছিল। রামমোহন না এলে আমাদের মিনতিকে ওর শ্বশুর বাড়ির লোক স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়িয়ে মারত।

এর পরেও বিধবা নারীর যন্ত্রণা শেষ হয় নি। নারীর এই দুর্দশার মুক্তিদাতা হয়ে বাংলার বুক চিরে বেরিয়ে এলেন তেজোদীপ্ত এক মহাপুরুষ। তিনি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি প্রথম বিধবা নারীর সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন। পুনরায় বিধবা নারীর জীবনে তিনি ফিরিয়ে আনেন দাম্পত্য সুখ আর একটা দীর্ঘ সংসার জীবন। বিদ্যাসাগরে আমার সহমত ছিল।
আমি দাদাকে বললাম,"মিনতির বিয়ে হবে ধুমধাম করে। সে যেন মনে না করে, সে একজন পাপিষ্ঠা। তাই তার স্বামী মারা গিয়েছিল। আমি সঙ্গে আছি।"
দাদা আমাকে বললেন,"বিয়েটা গোপনে সারা হবে। জানাজানি যা হবার পরে হবে। কেউ প্রশ্ন করলে তুই সামাল দিস।"
আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম,"ঠিক আছে।"
দাদা উঠে গেল। সমাজের চোখ রাঙানিকে ভয় পেয়েছে সে। আবার বাবা হয়ে দুঃখ সহ্য করতে পারছে না। তার সাহসী পদক্ষেপে আমি খুশি হয়েছি।

প্রায় দশ দিন পর মানুষ কানাকানি করছে। কেউ বলছে, মেয়েটাকে ওর বাবা-মা কোথায় দিয়ে এলো?
কেউ বলছে,মেরে ফেলেছে হয়তো।

অনেকের মন্তব্য, এমন জায়গা আছে, সেখানে মেয়ে জন্মায় না। তারা মেয়ে কিনে নিয়ে বিয়ে করে।
হয়তো সেই দেশের লোক নিয়ে গেছে। বিধবা মেয়েকে বাড়িতে রেখে কি করবে? পাঁচ জন পাঁচ দিক থেকে পাঁচটা দিল ছুঁড়বে।
একজন বলল,"ওকে নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছে। তারা নাকি মেয়ের মতো রাখবে বলেছে।"
গুজবগুলো কানে এলেও করো কথার জবাব দিলাম না।

ওদিকে ছেলে আর তার বাবা-মা ছাড়া মেয়ের পূর্বের বিয়ের ঘটনা সে গ্রামে কেউ জানে না। ভালো আচরণের জন্য মেয়ের সেখানে ভালো সম্মান হয়েছে। সংসারে অভাব অনটন থাকলেও সুখের ঘাটতি নেই।

দেড় বছর পরে দাদার মেয়ে জামাই ঘরে এসেছে। কানে কানে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। দু-চার জন জড়ো হচ্ছে গোলমাল বাধানোর জন্য। আমি তখন স্কুল থেকে ফিরেছি। ব্যাপারটা জানতাম না। একজন যুবককে জিজ্ঞেস করলাম,"ব্যাপার কি? লোকজনের জমায়েত কেন?"
সে আমাকে উপহাস করে বলল,"আপনি যেন কিছুই জানেন না। আপনার বিধবা ভাইঝি স্বামী-সন্তান নিয়ে এসেছে।"
আমি বললাম,"তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?"
"না।" বলেই সে ছলে গেল।

পরদিন সকালে ভাইঝি ও ভাইঝি জামাই তাদের কোলের মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। শিশুটিকে দেখে মনে হলো না সে বিধবার সন্তান। তার গালভরা হাসি দেখে মনে হয় একটি সুন্দর ফুল হাসছে। ভাইঝিও একটা সুন্দর জীবন ও সংসার পেয়েছে।

আমার বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেলে আমার এক জেঠিমা এসে বলল,"খোকা, মিনতি কি বলছিল?"
আমি বললাম,"দেখা করতে এসেছিল।"
জেঠিমা বলল,"তুই কিছু বললি না।"
আমি বললাম,"ওদের আশীর্বাদ করেছি।"
"কি আক্কেলে ওর বাবা ওকে বিয়ে দিয়েছে? এখন আবার কি জন্য মেয়ে জামাই বাড়িতে এনেছে?" রোষে ফুঁসতে থাকে জেঠিমা।
জেঠিমাকে বসতে দিলাম। আমি তাকে বললাম,"বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ।"
জেঠিমা বলল,"না। লোকটা কোথায় থাকে?"
আমি বললাম,"মেদিনীপুরে বাড়ি। কোলকাতায় থাকতেন। তিনি মেয়েদের পড়াশুনোর জন্য অনেক বই লিখেছেন, অনেক স্কুল তৈরি করেছেন। তিনি দেখেছিলেন কম বয়সী

বিধবাদের নিয়ে নানা কথা ওঠে। মানুষ তাদের খারাপ চোখে দেখে। অনেক সময় তারা ধৈর্য রাখতে না পেরে কুকাজে জড়িয়ে পড়ে।"
আমি দেখলাম জেঠিমা ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছে। আমি আবার বললাম,"বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াতেন। তিনি প্রথম একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তার সম্মান বেড়েছে বৈ কমেনি।"
জেঠিমা গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি বললাম,"মিনতি ভালো সংসার করছে। ওর যদি কোন অধোপতন হতো, আমাদের সম্মান চলে যেত। এখন সে একটি সাধারণ মেয়ের মতো সংসার পেয়েছে। তোমার ভালো লাগছেনা?"
জেঠিমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল,"কে এবার ঝামেলা করতে আসে দেখি। ঝেটিয়ে বিদেয় করে দেব।"
তারপর চলে গেল।
মনে মনে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে বললাম,"তুমি যুগ যুগ ধরে এভাবে বিধবা নারীদের রক্ষা করে যেও দয়ারসাগর।"

প্রবন্ধ

গোপাল বিশ্বাস
জনসাধারণের কবি নজরুল ইসলাম

বাল্যকাল থেকেই কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে কাজী নজরুলের পরিচয় ঘটেছিল। পাড়াগাঁয়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরের যোগাযোগ, তাদের সঙ্গে কবির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। লেটোর দলের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিচিত্র মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যুদ্ধের সৈনিকরূপে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশের সশস্ত্র বিপ্লবীদের ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার সূত্রে দেশের পরাধীনতার যন্ত্রণার বারুদ জমা হয়েছিল। মুজাফ্ফর আহমদের মতো সাম্যবাদী নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসায় শ্রমিক -কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের জন্য সংগ্রামের রূপ তাঁর নিকট প্রকট হয়ে ওঠে। এসব কারণে সমকালীন কবিদের থেকে নজরুল ইসলাম বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। তিনি বিদ্রোহীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর বিদ্রোহ নতুন যুগের মানব ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অত্যাচার, অনাচার, অন্যায়, অবিচার, শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানুষের আত্মশক্তি উত্থানে তিনি মুখর। নতুন যুগের মানুষের বীর্যবত্তা ও পৌরুষের জয়গান উইলিয়াম আর্নেষ্ট হেনসের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে "I am the master of my fate"... "I am the captain of my soul" নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে উদ্‌বুদ্ধ, আত্মশক্তি ও দেববিদ্রোহ মানুষের মর্মবাণী।

শুধু কবিতার মাধ্যমেই নয়, তাঁর গদ্যরচনা এবং নাট্যরচনাতেও আমরা মানবমমুক্তির কথা পাই। 1939 সালে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস "কুহেলিকা" প্রকাশিত হয়। সে সময় আইন অমান্য আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের দাপট, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের চরম সন্ত্রাস : সে সময়ে অমিত সাহসে ভর করে কাজী নজরুল "কুহেলিকা" প্রকাশ করেন। এই উপন্যাসের একটি সংলাপ "আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারত নয়রে অনিম! আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবন নই, তবু আমি শুধু ভারতের জলবায়ু - মাটি - পর্বত - অরণ্যকেই ভালবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মুক-দরিদ্র - নিরন্ন পরপদ দলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয় :হিন্দুস্থান নয়। আমার ভারতবর্ষ মানুষের, যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ হ**.
**এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয় মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয় __ এ আমার মানুষের - মহামানুষের মহাভারত। "
প্রায় একশত বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক কবির এই লেখা " বর্তমান ভারতবর্ষে জাতপাত ধর্মের যে নৃশংস রূপ সেখানে দাঁড়িয়ে কবির এই বাণী বারবার পড়তে এবং সাধারণ মানুষকে পড়াতে সাধ জাগে। " তাঁর সাহিত্য সাধনায় মানুষের কল্যাণের কথাই উচ্চারণ করেছেন। ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য সর্বত্রই তিনি নিখিল বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর মানবিকতার আদর্শ প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন, যেখানে তা পাননি সেখানেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম এই ধারণায় বিশ্বাস করেও মনে করতেন ভগবানের সৃষ্টির মধ্যেই সাম্য, আনন্দ, ভালোবাসার বাণী উচ্চারিত ছিল। লোভী স্বার্থপর, হিংস্র কিছু মানুষ বৈষম্য এনে তা কলুষিত করেছে। মানুষ যদি জেগে ওঠে, সেই লোভী শয়তানেরা নিঃশেষ হবেই। তাই মানুষর মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগাতে তিনি গেয়ে ওঠেন -
" নাই দানব, নাই অসুর, /
চাইনে সুর, চাই মানব! /
বরাভয় বাণী ঐ যে কার /
শুনি হৈ রৈ এবার।" (আগমনী:অগ্নিবীণা) ।
"কুলিমজুর" কবিতায় মনুষ্যত্বের যথার্থ ধারকবাহক কুলিমজুরদের বেদনার মধ্যেই নবযুগের পদধ্বনি শুনিয়েছেন।
তখন দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব। বৃটিশ সরকার কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছে। এই সময়ে নজরুল ইসলাম সমাজে শ্রমিকদের ভূমিকার চিত্র তুলে ধরলেন __
"কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা /
******
তুমি জাননাকো কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে /
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে!"
তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন _
"তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান।"
তাঁর কবিতায় শোষিত মানুষ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে - -
"ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর:/
মরিয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার।

শতশতাব্দী ভাঙ্গেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান /
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় জয় নব উত্থান। " তাঁর সাম্যবাদী কবিতা মামলায় এভাবেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে। উন্নয়নের প্রতিটি পর্ব শ্রমিকের গায়ের রক্ত জল করে গড়ে উঠেছে। তাই নিপীড়িত মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানবতাবাদী কবি মানুষ ও মানুষের ঐক্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
"মানুষ" কবিতায় বলেছেন মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।
"নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, /
সব দেশে সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"
স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উদযাপনের প্রস্তুতির মধ্যেও আমরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান, ছোটোজাতি, উচ্চবর্ণ ইত্যাদি সামাজিক বৈষম্য থেকে বের হতে পারিনি। ইদানীং রাষ্ট্রীয় মদতে এসব কিছুর বাড়বাড়ন্ত ঘটছে। এই সামাজিক পাপে আমরা কমবেশি সবাই পাপী। অথচ প্রায় শতবর্ষ আগে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ধর্মীয় শাসন শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শুরু করে ধর্মের বেড়াজালে আটকে রেখে তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করেছে ধর্মীয় গুরুকুল। তাই কবি গাইলেন _
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়। /
মানুষেরে ঘৃণা করি, /
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি। /
*. *. *. *
মুর্খেরা সব শোনো, /
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"
১৯২৫ সালে এই কবিতাটি লিখেছেন। শতবর্ষ পেরিয়ে সারা পৃথিবী যখন বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে উন্নতির শিখরে, ভারতবর্ষ তথা ভারতীয় উপ মহাদেশে ধর্মের আচারে বিজ্ঞানে শিক্ষিত মানুষ নিজেকে ধর্মের কাছে সঁপে দেয়! ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে পাশবিক উল্লাস ধ্বনিতে মানুষকে হত্যা করে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ ও স্বাধীনতা ধ্বংসের জন্য পথে নামে, তখন নজরুল ইসলামের এসব কবিতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নজরুল ইসলামও হয়ে ওঠেন ভীষণভাবে তাৎপর্য পূর্ণ। তাঁর কণ্ঠে শুনি __
"ও কে? চন্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণার জীব! /
ও ই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ও ই শ্মশানের শিব।"
জনসাধারণের জন্য কবি বারবার শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন ভোগবাদী, লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী সমাজ - প্রভুদের বিরুদ্ধে। সমাজের ধনী তথা উচ্চশ্রেণির মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন। যতদিন এই অসাম্য দূর হবে না, গরিব শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ হবে না, ততদিন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা প্রাসঙ্গিক থেকেই যাবে।

অনুবাদ কবিতা

বাংলা অনুবাদ: **সঞ্জিতা সেন**
আমাদের এই শীতের দিনগুলিতে
মুল রচনা: In these our winter days – C Day Lewis

এই আমাদের শীতের দিনগুলিতে
মৃত্যুর ধাতব জিভ মুখর হয়েছে
আতঙ্কে অসার হয়ে আমরা সকলে
জ্বলন্ত গোলকের ভূআস্তরণে
সবুজ সময় আজ অপসৃত হয়েছে কবরে
আলোর প্রহর হাতে গোনা
তুষার প্রান্তরে আমাদের সূর্য এখনও
রক্তিম রেখা আঁকে হিমানীর পরে-
ফটকের শিকগুলো ভেদ করে মৃত্যু তাও
চেষ্টা করে তার হাজার হাজার ফলা
আমাদের দিকে পাঠাবার।
ঘুমন্ত ভালোবাসা, লুপ্ত নয়,
ছুটে এসে ভেঙে দেয় ভয়াল স্বপ্নের
আবরণ।
আমাদের চোখ নয়, দেখবে অন্য কোনো
চোখ
আগামীর আকাশচুম্বী এক আলোর
ঝলকানি,
নব যুগ, নতুন জগৎ।

বাংলা অনুবাদ: **নীলাঞ্জন কুমার**
নদীতো ফিরতে পারে না
মুল রচনা: The River cannot go back – Kahlil Gibran

মনে করি, নদীর মন অন্তত একবার
কেঁপে ওঠে সাগরের সাথে
মিলনের আগে।
যে পথ দিয়ে প্রিয়ে আসে
সে পথে সে ফিরে তাকায়।
পর্বত চূড়া থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ
জঙ্গল, গ্রাম শহরের ছবি ভাসে
তার চোখে। এখনতো শুধু জলরাশি
তার অপেক্ষায়। সে জানে সে সেখানে
গেলেই বিলুপ্ত হবে।নদীতো ফিরতে পারে না,
কেউই তো পারে না; ফেলে আসা সমুদ্রের
পরিবেশে মিশে তার ভয় চিরতরে
বিলুপ্ত হবে।তবেই তো নদী বুঝবে
এ তার অস্তিত্বের বিলোপ নয়।
নতুন পরিচয়ে বাঁচার শুরু।

 কপিরাইট © 2022 চিত্রোক্তি - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা। পঞ্চম অনলাইন সংখ্যা, জুন-জুলাই ২০২২, বর্ষা ১৪২৯ | সর্বস্বত সংরক্ষিত

গ্রন্থ আলোচনা

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
উদ্রিক্ত বেদনার হুতাশ ও নাস্তিকতা

'পুরোনো মানুষের মধ্যে আমরা এতদিনের জানাশোনা সেই পুরোনো মানুষটাকেই দেখতে চাই আবার ' - বর্ষীয়ান কবি নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ' ঈশ্বর এবং মানুষ ' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে কবি শঙ্খ ঘোষের এই কথাগুলি মনে এল।এই কাব্যগ্রন্থটির আগে তাঁর আরও বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।সেখানেও নরেন্দ্রনাথ আবহমান মানুষের ও মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন বলেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও সেই পুরোনো ফর্মের মানুষ ও মানুষতাকে কবি গতানুগতিক বিন্যাসে পরিবেশন করেছেন, এমনটি নয়। আবহমান মানুষের ও মানুষতার ভেতরেও যে নবতর মানবতার উদ্বোধন,যা কবির অণ্বিষ্ট,তারই শিল্পিত অভিব্যক্তি 'ঈশ্বর এবং মানুষ'। তথাকথিত ঈশ্বর বিশ্বাসকে সচেতনভাবেই তাঁর বোধ ও অন্তরলোক থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং মানুষকে মৃত ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধীর আসনে বসিয়ে নরেন্দ্রনাথ' সবার উপরে মানুষ সত্য 'এই মেসেজ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই অবিশ্বাস শৌখিন মজদুরি নয়। বরং হৃদয়সঞ্জাত অনুভব।মোট চল্লিশটি কবিতা নিয়ে গড়ে ওঠা এই কাব্যগ্রন্থে কবি পেলব শব্দবন্ধে কবিতার মদিরতার বদলে শানিত তীরের ফলার মতো শব্দ ব্যবহার করে বহুযুগ লালিত আস্তিকতাকে বিদ্ধ করেছেন। মানুষের লাঞ্ছনায় তাঁর চিত্ত দেশে যে বেদনা উদ্রিক্ত হয় সেই বেদনার অভিঘাতে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার অবয়ব। সেই অবয়ব ঋজু, সংহত,অথচ কঠিন ও তীক্ষ্ণ। মানুষ যদি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়, তবে কেন মানুষে মানুষে হানাহানি? এই প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথকে বিব্রত করে।আর সেই বিব্রত বোধ থেকে বেরিয়ে আসে ' ঈশ্বর ও মানুষ ' ' পায়ের তলায় সভ্যতার আবর্জনা ' ' ভৌতিক ঈশ্বর ' ইত্যাকার কবিতাগুলি। কবি নরেন্দ্রনাথ মরমী।তাই তিনি লেখেন -
১। ঈশ্বর যিনি জীবনের লাগাম/ধরে রেখেছিলেন/তিনি নেই। (ঈশ্বর ও আমি)
২। জেগে আছে, জেগে থাকে ভৌতিক ঈশ্বর। (ভৌতিক ঈশ্বর)
৩। পড়ে আছে দেবতাদের ক্ষত বিক্ষত লাশ/পূজারি ব্রাহ্মণ সহায় সম্বল হীন হাঘরে ভিক্ষুক। (উত্তরাখণ্ড) ইত্যাদি।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সৌম্যদীপ দাশ।বিষয়ভাবনার সঙ্গে বেশ সম্পৃক্ত। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভালো। কাগজ আরও একটু ভালো হলে ভালো হতো।সব মিলিয়ে হাতে তুলে নেওয়ার মতো বই।

ঈশ্বর এবং মানুষ
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
প্রকাশক- শামুক
দাম- ষাট টাকা।

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

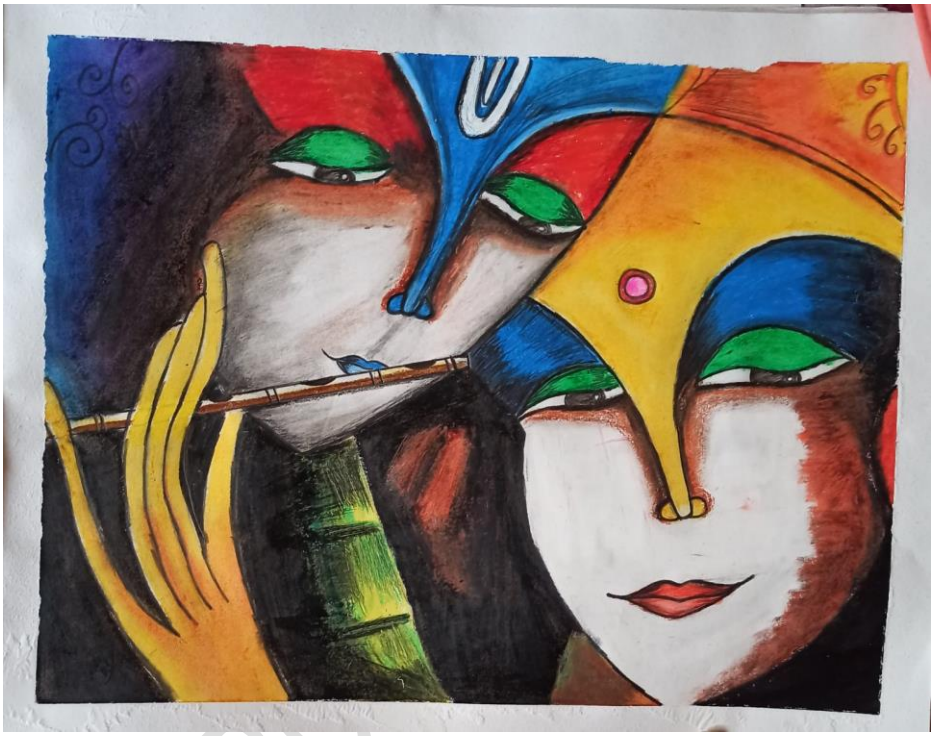

গার্গী চট্টোপাধ্যায় – নবম শ্রেণি

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year 5th Issue, Barsha Sankhya, Online, June-July 2022.